'ফরিদাবাদ মজদুর সমাচার' এর স্রষ্টা সাথী শের সিং লাল সেলাম!

গত ২৫শে জানুয়ারি আনুমানিক ৭৫ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন 'ফরিদাবাদ মজদুর সমাচার' এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ও প্রকাশক শের সিং।

১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে দেশে যে'কটা গুরুত্বপূর্ণ শিল্প শহর গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে অন্যতম হরিয়ানা রাজ্যের শহর ফরিদাবাদ। ১৯৬০-৭০র দশকে পশ্চিমবঙ্গ থেকে যখন একের পর এক কারখানা মালিকেরা লক-আউট ঘোষণা করে পশ্চিমদিকে যাত্রা শুরু করেছে, তখন এই শহরেও নতুন নতুন কারখানার সংখ্যা বাড়তে থাকে। '৭০ এর দশকের শেষ দিকে ফরিদাবাদ ভারতের বৃহত্তম শিল্পাঞ্চল হয়ে ওঠে। সেই সময়ে সেখানে সারা দেশের মোট ট্র্যাকটরের প্রায় ৪০ শতাংশ, মোটরসাইকেলের একটা বড়ো অংশ উৎপাদন হচ্ছে। এছাড়া, বিভিন্ন মাপের ইস্পাত কারখানা, বস্ত্র বয়ন কারখানা, রাসায়নিক তৈরির কারখানা, ওষুধের কারখানা, জুতো, রাবার ইত্যাদি নানাবিধ শিল্প উৎপাদনের আঁতুড়ঘর হয়ে উঠেছে ফরিদাবাদ। এরকমই একটা সময়ে, ১৯৮২ সালে, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী রাজনীতির ভাবনায় আলোড়িত এক যুবক, কমরেড শের সিং এর হাত ধরে 'ফরিদাবাদ মজদুর সমাচার' এর পথ চলা শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে, এই মাসিক পত্রিকা মারফত কারখানা শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ক ব্যাপক প্রচার চালানো হয়। প্রাথমিক পথ-চলার দু'বছরের মাথায় ট্রেড রাজনীতির সাধারণ কিছু সমালোচনা হাজির করে ১৯৮৬ সালে নতুন ভাবে পথ চলা শুরু করে এই পত্রিকা। শের সিং শুরু থেকেই নতুন সমাজ গড়ে তোলার কাণ্ডারি হিসেবে শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক ভাবনার চর্চা-আলোচনার ওপর জোর দেন। যদিও পরবর্তী নানান আঁকবাঁকের মধ্যে দিয়ে পত্রিকাটির চরিত্রের বদল হতে হতে যায়। পত্রিকায় জোর পায় বিভিন্ন কারখানা তথা শিল্প ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সংকট, সমস্যার কথা, লড়াই-আন্দোলনের খবর ইত্যাদি। '৯০ এর দশক থেকে উৎপাদনের পদ্ধতির নানান বদলের সাথে বদলে যেতে থাকে শ্রমিক আন্দোলনের ছবিও। সেই সময় থেকে পত্রিকাটির ব্যাপ্তিও বাড়ে। ফরিদাবাদ ছাড়িয়ে নয়ডা, ওখলা, গুরগাঁও এ তৈরি হওয়া নতুন নতুন শিল্প কারখানার শ্রমিকদের সাথে সংযোগ তৈরি করে এই পত্রিকা। শ্রমিকদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে তোলা, মালিকের সাথে দর-কষাকষির ক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিজস্ব অংশগ্রহণ ইত্যাদি নানা প্রশ্নে শের সিং এর অনমনীয় অবস্থান বজায় ছিল। এক-নেতা-কেন্দ্রিক ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তিনি বরাবর আওয়াজ উঠিয়েছেন। সামগ্রিকভাবে মজুরি-ব্যবস্থার সমালোচনা শের সিং সম্পাদিত 'ফরিদাবাদ মজদুর সমাচারে'র অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। কোনও বিষয়ে একমাত্রিক বক্তব্য হাজির করার তুলনায় সমণ্বয়, মতের আদান-প্রদান, কথোপকথনের ওপর ভিত্তি করে একটি আলাপ-আলোচনার পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে শের সিং কাজ করে গেছেন।

জীবনের শেষ দিন অব্দি ফরিদাবাদের এক শ্রমিক মহল্লা অটোপিন ঝুগগি'র অফিস ঘরই ছিল তার আস্তানা। আজীবন শ্রমিক শ্রেণীর স্ব-সংগঠন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে চলা, সামগ্রিকভাবে কমিউনিস্ট বিপ্লবী আন্দোলনের প্রশ্নে বিভিন্ন বিতর্কিত অবস্থান সত্ত্বেও সৎভাবে নিজের ভাবনা ও আদর্শকে জীবনে লালন পালন করার প্রশ্নে সাথী শের সিং এক উজ্জ্বল নিদর্শন। শ্রমিক শ্রেণির মুক্তির সংগ্রামে জীবন সমর্পিত করা অগণিত নক্ষত্রের মধ্যেই একজন ছিলেন সাথী শের সিং। তাকে জানাই লাল সেলাম।

সংগ্রামী ঐক্যের লক্ষ্যে – সেলস শ্রমিকদের কর্মসূচি

গত ১০ জানুয়ারি '২৫ কলকাতা কর্পোরেশন বিল্ডিং এর পাশে সেলস কর্মীদের ডাকে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হোলো। এই রাজ্যে সেলস কর্মীদের সর্ব বৃহৎ সংগ্রামী সংগঠন অল ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভস ইউনিয়নের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উদযাপনের ডাকে পাহাড় থেকে সাগরে, লাল মাটি থেকে সবুজ প্রান্তরে এক মাস ব্যাপী জাঠা কর্মসূচী সমাপ্তির সমাবেশ অনুষ্ঠানের আগে সুবোধ মল্লিক স্কয়ার থেকে এক প্রতিবাদী মিছিল ধর্মতলা পর্যন্ত আসে। সেলস কর্মী সহ প্রায় এক হাজার খেটে খাওয়া মানুষের উপস্থিতি ছিলো এই মিছিলে।গত ৯ ডিসেম্বর '২৪ কুচবিহার থেকে শুরু হয় এই জাঠা কর্মসূচি। প্রায় ৪০০০ কিলোমিটার পথ পরিক্রমা সহ ১০০ টির বেশি পথসভা হয়েছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ও সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য। বর্তমান সময়ে যখন ধর্ম - বর্ণ- জাতপাতের নামে সাধারণ মানুষকে বিভাজিত করা হচ্ছে তখন সমস্ত স্তরের খেটে খাওয়া মানুষের সংগ্রামী ঐক্যের লক্ষে এই জাঠা সত্যই অন্যমাত্রা যোগ করেছে।

মূলত নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণ, কৃষকের ফসলের দাম নির্ধারণে অধ্যাপক স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশ সঠিকভাবে কার্যকর করা, সমস্ত ঔষুধ সহ স্বাস্থ্য সরঞ্জাম থেকে জি এস টি তুলে নিতে হবে, স্বাস্থ্য নাগরিকের মৌলিক অধিকার তাই স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কে বেসরকারি হাতে তুলে দেওয়া যাবে না, বীমার চাতুরী নয় - চাই সার্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা, রাষ্ট্রয়ত্ত প্রতিষ্ঠান বিক্রি করা চলবে না, সেলস পেশা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ত্রিপাক্ষিক কমিটির সভা ডাকতে হবে, শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী 'শ্রমকোড ' বাতিল করা, এই রাজ্যে মেডিকেল সেলস কর্মীদের জন্য হাইলি স্কিল্ড লেবার হিসাবে ন্যুনতম মজুরি ঘোষণা করা সহ বিভিন্ন দাবিতে এই জাঠা কর্মসূচি হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষের দুর্দশার কথা শোনা গেছে। ঠিকা বা চুক্তি ভিত্তিক নিয়োগ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বেড়ে যাওয়ার ফলে কর্মচ্যুতি ও অনিশ্চয়তা বাড়ছে। সমাবেশে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের খেটে খাওয়া মানুষের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। যেমন নাগরিক মঞ্চের গৌতম ঘোষ, সিলিকোসিস্ আক্রান্ত শ্রমিক সংগ্রাম কমিটির তাপস গুহ, আই এন টি ইউ সি র দিব্যেন্দু মিত্র, ইউ টি ইউ সির দীপক সাহা, এ আই টি ইউ সির বিপ্লব ভট্ট, সি এস টি ইউ এর অমিতাভ ভট্টাচার্য, এ আই সি সি টি ইউ এর শিলা দে সরকার, এ এইচ এস ডির ডাক্তার উৎপল ব্যানার্জী, হিন্দমোটর এস এস কে ইউ এর শুভেন্দু বিশ্বাস,দ্বারকানাথ কোটনিস স্মৃতি রক্ষা কমিটির শ্যামল ঘোষ, ইফটুর আশীষ দাসগুপ্ত, ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভস ইউনিয়নের দীপক কুমার ও আশীষ কুসুম ঘোষ, বি পি এস আর এর সন্ত কুমার, এম পি এম আর এর আশুতোষ পান্ডে, পি এস আর ইউ এর সজল দেবনাথ এবং আয়োজক সংগঠন এর সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ রায় বক্তব্য রাখেন। অভিজিৎবাবু বলেন যে, মেহনতি মানুষের স্বার্থে রাজ্য জুড়ে এই জাঠা মেহনতির আন্দোলন অভিমুখ সঠিক রাখার লড়াই। দলীয় বাধ্যবাধকতার দুর্বলতা কাটিয়ে বঞ্চিত মানুষের সংগ্রামী ঐক্যের লক্ষ্যে সার্বিক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রস্তুতি ও অনুশীলন এই জাঠা। ভোটের গাউনি নয়, দাবি না মেটা পর্যন্ত শোষক -শাসকের থেকে বেঁচে থাকার অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার লাগাতার আন্দোলন চালিয়ে যেতেই হবে।

ছত্তিশগড়ে সাংবাদিক হত্যা

গত ১লা জানুয়ারি থেকে নিখোঁজ ছিলেন ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলার সাংবাদিক মুকেশ চন্দ্রকর, বয়স ৩৩। তার দুদিন বাদে এক নির্মীয়মান সেপটিক ট্যাংকের ভিতর থেকে তার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। এই হত্যার মধ্য দিয়ে নতুন বছরের শুরুতেই ছত্তিশগড় তথা সারা দেশের সাংবাদিকদের যেন এক বার্তা দেওয়া হল।

কে ছিলেন এই তরুণ সাংবাদিক? কেন খুন হতে হল তাকে?

মুকেশ চন্দ্রকর ছিলেন এক স্বাধীন সাংবাদিক। অর্থাৎ, কোনও বড়ো মাপের সংবাদ সংস্থার সাথে যুক্ত না হয়ে তিনি নিজের উদ্যোগে বিভিন্ন মাধ্যমে সংবাদ পরিবেশন করতেন। 'বাস্তার জাংশন' নামের একটি নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল ছিল তার। প্রায় ২ লক্ষ দর্শক সেই চ্যানেলটির সাথে যুক্ত ছিলেন। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় সংবাদ সংস্থার হয়েও তিনি কাজ করতেন। এলাকার মানুষের সমস্যার খবর, সাধারণ মানুষের ওপর অন্যায়-অত্যাচারের খবর, রাজনৈতিক নেতা-ঠিকাদারদের দুর্নীতির খবর তুলে ধরতেন। কিছুদিন আগে তিনি নিজের এলাকার একটি রাস্তা বানানো নিয়ে ঠিকাদারের দুর্নীতির ওপর এরকমই একটি খবর করেন। তার পর থেকেই ঠিকাদারের লোকজনের থেকে নানান উপায়ে হুমকির মুখে পড়ছিলেন তিনি। এরপরেই তার গুম হয়ে যাওয়া, এবং সাংবাদিক সহকর্মীদের সক্রিয়তায় তার দেহ উদ্ধার হয় একটি সেপটিক ট্যাংক থেকে।

মুকেশের খুনের ঘটনায় পুলিস এখনো অব্দি গ্রেপ্তার করেছে অভিযুক্ত ঠিকাদার সুরেশ ও আরো কয়েকজনকে। এছাড়াও দুর্নীতির অভিযোগে বরখাস্ত করা হয়েছে পাবলিক ওয়ার্কস দপ্তর (পি ডব্লু ডি) এর দুই ইঞ্জিনিয়ার ও মহকুমা আধিকারিককে। সাংবাদিক মহলের অভিযোগ তাদের তরফ থেকে লাগাতার চাপ না থাকলে এবং এই নিয়ে সামাজিকভাবে শোরগোল না উঠলে এটুকুও হত না। তারা আশংকা করছেন, এই চাপ যদি বজায় রাখা না যায়, তাহলে মুকেশের খুনীরা জেল থেকে ছাড়াও পেয়ে যেতে পারে। স্বাধীন সাংবাদিক মুকেশ চন্দ্রকরের ভয়াবহ হত্যার নিন্দায় 'প্রেস ক্লাব অফ ইন্ডিয়া'ও বিবৃতি দিয়েছে। সত্য পরিবেশনের জন্য কর্মক্ষেত্রে বা অন্যত্র সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ দেশ তথা সারাবিশ্বেই নতুন কিছু নয়। এখনো কিছু সাংবাদিক রয়েছেন যারা বড়ো পুঁজির মালিকানাধীন সংবাদ সংস্থার অংশ না হয়ে নিজস্ব উদ্যোগে জনতার স্বার্থে সংবাদ পরিবেশনের চেষ্টা করেন। বড়ো পুঁজি- শাসক গোষ্ঠী - দুর্নীতিবাজ অফিসার, ঠিকাদারদের আঁতাতের উল্টোদিকে এদের অবস্থান। এই নির্ভীক, সৎ সাংবাদিকদের যে শাসকেরা পছন্দ করে না, এমনকি প্রয়োজনে তাদের হত্যার ছাড়পত্রও যে তারা দিয়ে রাখে তা আমরা আগেও দেখেছি। আজ থেকে ৮ বছর আগে ২০১৭ সালে বেঙ্গালুরুতে খুন করা হয় সাংবাদিক গৌরি লঙ্কেশকে। তিনি লাগাতার আওয়াজ তুলছিলেন হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তির অপকর্মের বিরুদ্ধে। মুকেশও ছত্তিসগড়ের বাস্তার থেকে লাগাতার আওয়াজ তুলছিলেন তার এলাকার মানুষের নানাবিধ সমস্যা নিয়ে। চোখের সামনে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি দেখে মুকেশের মতো সাংবাদিক চুপ থাকেননি। তার ফলেই তার এই মর্মান্তিক পরিণতি। সারা দেশের স্বাধীন সাংবাদিকেরা দাবি জানাচ্ছেন তাদের জন্য বিশেষ সুরক্ষামূলক আইন চাই। শাসকের বা ক্ষমতাশালীদের রক্তচোখের তোয়াক্কা না করে সাংবাদিকদের সত্য পরিবেশন করার অধিকারকে সুরক্ষিত করা চাই।

নারকেলডাঙা খালপাড়ের ঝুপড়ির মানুষদের লড়াই চলছে

বিশ্বজিৎ হালদার

গত ২৮শে ডিসেম্বর নারকেলডাঙায় খাল সংস্কারের নাম করে বিনা নোটিশে ভেঙে দেওয়া হয়েছিল বেশ কিছু ঝুপড়ি ঘর। এখানকার বাসিন্দাদের প্রতিরোধে সাময়িকভাবে পিছু হঠে উচ্ছেদকারীরা। বস্তির সকল মানুষ জোট বাঁধতে শুরু করে, তাদের মতো করে প্রতিবাদ, লড়াই গড়ে তোলেন। সঙ্গে যোগ দেন অন্য বস্তির লড়াকু সাথীরা, অধিকার আন্দোলনের কর্মীরা। এখানকার বস্তিবাসী এবং বিভিন্ন লড়াকু সংগঠন মিলে যৌথ উদ্যোগে "বস্তি অধিকার রক্ষা মঞ্চ" গড়ে তুলে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। মঞ্চ গড়ে তোলার আগে এবং পরে বস্তির মহিলা, পুরুষ, বাচ্চারা মিলে কয়েক দফা মিছিল করে, স্লোগান তুলে উচ্ছেদকারীদের জানিয়ে দেন, "বিকল্প ব্যবস্থা না করে উচ্ছেদ করা যাবে না।" "উচ্ছেদ যদি করতেই হয়, তাহলে পুনর্বাসন দিতে হবে"- এই দাবীসহ বস্তির মানুষের বাসস্থানের অধিকার,

নাগরিক পরিষেবা সহ একাধিক দাবী দাওয়া নিয়ে চিঠি দেওয়া হয় সেচ এবং কর্পোরেশনের বিভিন্ন দপ্তরে।জানুয়ারি মাসের গোড়া থেকেই একাধিক বার এই বিষয়গুলো নিয়ে ২৯ নং ওয়ার্ড ও ৩ নং বরোতে কাউন্সিলর ও চেয়ারম্যানের সাথে কথা বলতে গিয়ে দেখেছেন শুধুই নীরবতা। খালি হাতে ফিরতে হয়েছে।

২৮ শে জানুয়ারি দুপুর ১:৩০ নাগাদ হঠাৎই বিশাল পুলিস বাহিনী এসে একাধিক ঘর ভেঙে দেওয়ার হুমকি দেয় এবং আন্দোলনের নেতৃত্বকে ভয় দেখায়। পালটা জোট বেঁধে নিজেদের ন্যায্য দাবিদাওয়া সম্বলিত কণ্ঠস্বর নিয়ে সওয়াল করেন বস্তিবাসীরা। সাময়িকভাবে পিছু হঠতে বাধ্য হয় পুলিস। ঐদিনই মিছিল করে নারকেলডাঙা থানায় গিয়ে বস্তিবাসীরা বিক্ষোভ দেখান এবং পুলিসকে জানিয়ে আসেন -- বস্তিবাসীদের সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করে কাজ করতে। জানানো হয় বিকল্প থাকার জায়গার ব্যবস্থা না করলে একটিও ঘর ভেঙে নেওয়া মানা হবে না।

এই বস্তিরই একটা বড়ো অংশ গত পাঁচ বছরের মধ্যে দু'বার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার পরও ঐ বস্তির কাউন্সিলর তথা কলকাতা পুর নিগম পাশে দাঁড়ানো বা আবার ঘর বাঁধতে সাহায্য করা তো দূরের কথা বিভিন্ন সময়ে নানান ছুতোয় বস্তিবাসীদের উচ্ছেদের হুমকি দিয়েছে। এমনকি তাদের প্রয়োজনীয় বিভিন্ন প্রমাণপত্র পুড়ে যাওয়ায়, সেগুলো নতুন করে বার করতে গিয়ে দিনের পর দিন নানান টালবাহানায়, এটা সেটা কাগজপত্র চেয়ে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখনও তারা সেসব ডকুমেন্ট তৈরি করতে পারছেন না। বাচ্চাদের জন্মের প্রমাণপত্রগুলো পুড়ে যাওয়ার পর আর নতুন করে তৈরী করতে পারেনি, তাই সেই সকল বাচ্চাদের স্কুলেও ভর্তি করাতে পারছেন না তারা।

বস্তির উল্টো দিকই ছোটো- বড়ো কারখানা আর টাকাওয়ালাদের ফ্ল্যাট বাড়ি। একদিকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বাঁশ আর কালো প্লাস্টিকে মোড়া ঘুপচি ঘুপচি ঘর, আরেকদিকে আলো ঝলমলে পাকা বাড়ি- যেখানে এই বস্তির মহিলারা শ্রম বিক্রি করে নিজেদের পেট চালান। নিজেরা নোংরা, আবর্জনার মধ্যে থাকলেও পেটের জন্য পাকা বাড়ির বাবুদের ঘরদোর ঝাঁট দেন, বাসন মাজেন, ফাইফরমাশ খাটেন। হাজারেরও বেশী সংখ্যায় বসবাসকারী এখানকার বস্তিবাসী মানুষরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান- সকল কিছু থেকেই বঞ্চিত। না আছে কাজের নিশ্চয়তা, না আছে জীবনের নিরাপত্তা। অথচ এই বস্তির মানুষরাই নিজেদের শ্রম দিয়ে এই শহরকে বাঁচিয়ে রেখেছে। ভোট দিয়ে সাংসদ, সরকার নির্বাচিত করছে অথচ তারাই নাগরিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত।

রাষ্ট্রসংঘের 'হ্যাবিট্যাট ৩' সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদে বর্নিত বস্তিবাসী মানুষদের বাসস্থান, জমির ওপর অধিকার, নাগরিক পরিষেবা পাওয়ার অধিকার- ইত্যাদি নাগরিক অধিকারগুলো আর কতদিনে বাস্তবায়িত হবে? আর কত বস্তি আগুনে পুড়লে, সংবিধানের ২১ নং অনুচ্ছেদের 'জীবনের অধিকার' মান্যতা পাবে? আর কত প্রজন্ম এই বস্তিবাসী খেটে খাওয়া মানুষ শোষিত হলে ১৯ নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত বসবাসের স্বাধীনতা পাবে?

বস্তিবাসী মানুষরাও জানেন এই সকল অধিকার এমনি এমনি কেউ দেবে না, লড়াই করেই ছিনিয়ে নিতে হবে। আর তা এই কদিনের লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে তারা বুঝেছেন। উচ্ছেদ আটকানো গেছে তবে খাল সংস্কারের জন্য ঘর ভেঙে কিছুদিনের জন্য অন্যত্র থাকতেই হবে এবং ওয়ার্ড থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে আবার ঘর বাঁধতে প্রয়োজনীয় সামগ্রী (বাঁশ, ত্রিপল) যা লাগবে তারা নাকি ব্যবস্থা করবে। প্রতিশ্রুতি মতো কতটা কী হচ্ছে বা হচ্ছে না সেদিকে সংগ্রামী সাথীদের নজর থাকবে এবং সেই বুঝে পদক্ষেপ নেওয়া হবে। লড়াইয়ের এখানেই শেষ নয়। সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকার অধিকারের স্বরকে আরও জোরদার করতে এই লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। তাই আগামী দিনে যে যেভাবে পারবেন এই লড়াইয়ে পাশে থাকুন।

না হলে " বস্তিবাসী অধিকার রক্ষা মঞ্চে"র অবস্থান কালীন ঐ বস্তিরই একজন মহিলা, 'মদিনা'দি-র গাওয়া গান - 'আমরা এই বিশ্বের বুকে গড়বো রঙ মহল, সৃষ্টির নব মন্ত্রে মোরা করবো দিন বদল"- যা আমাদের সকলের স্বপ্ন; তা মিথ্যে হয়ে যাবে।

প্যালেসটাইন: নিজভূমে পরবাসী আরব মানুষ

উজ্জ্বল সেন

অবশেষে যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় হামাস আর ইজরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ বিরতি চুক্তি সম্পাদিত হল- কাতার, মিশর এবং মার্কিন মধ্যস্থতায়। ১৯ জানুয়ারী ২০২৫ থেকে প্রথম দফায় ছয় সপ্তাহের জন্য এই চুক্তি। ২০ শে জানুয়ারি ২০২৫ থেকে দফায় দফায় চলবে বন্দি প্রত্যর্পণ। হামাসের হাতে বন্দি ৩৩ জন ইজরায়েলীর বিনিময়ে ইজরায়েলের বিভিন্ন জেলে আটক ৭৪৭ জন প্যালেসটাইনের বন্দির। ইজরায়েল এই চুক্তিকে কতটা মান্যতা দেবে? সময়সীমা শুরু হবার আগেরদিন, অর্থাৎ ১৮ই জানুয়ারী ইজরায়েল ছয় ঘন্টা ধরে বোমা ফেলেছে গাজায়, মারা গেছে ২৩ জন প্যালেসটাইনি।

গাজা ৪১ কিলোমিটার লম্বা, ৬-১২ কিলোমিটার চওড়া একটা ভূখণ্ড। দক্ষিণে রাফা সীমান্ত মিশরের সাথে। উত্তরে আর পূর্বে ইজরায়েল। পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর। অধিবাসীর সংখ্যা ২১লক্ষের ওপর, ৯৯ শতাংশ আরব মুসলিম। জনঘনত্ব প্রতি কিলোমিটারে ছজ হাজার জন। গোটা পৃথিবীতে সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকাগুলোর মধ্যে অন্যতম। বর্তমান যে যুদ্ধ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য উত্তাল, তার শুরু অক্টোবর ২০২৩। যা ভয়াবহ আকার নেয় দক্ষিণ ইজরায়েলে ৭ই ডিসেম্বর ২০২৩ এ হামাসের হানার পর। যে হানায় ১২০০ ইজরায়েলি নিহত হয় এবং ২৩৪ জন্য হামাসের হাতে বন্দি হয়। এক সপ্তাহ ইজরায়েল সময় নেয় প্রস্তুতি নিতে। ১৪ ই ডিসেম্বর থেকে পূর্ণাঙ্গ হানা শুরু করে আকাশপথে আর স্থলপথে। একবছর পর ২০২৪ এর ডিসেম্বরে অন্তত ৪৭০০০ প্যালেসটাইনী নিহত হয়, যার মধ্যে ১৯০০০ শিশু। গৃহহীন হয় ১১ লক্ষ্য। গাজায় ৮০ শতাংশ বাড়ি/ইমারত/ভবন ধূলিসাৎ। ইউনাইটেড নেশনের হিসেব অনুযায়ী গাজাকে ২০২৩ পূর্ব বর্তী সময়ে ফিরিয়ে আনতে গেলে অন্তত আগামী ১৫ বছর পুনর্গঠন এর মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

_প্যালেসটাইন দেশটা মানচিত্রে আছে আবার নেইও_

বর্তমান বিশ্বে প্যালেসটাইন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে ইউনাইটেড নেশনের ১৯৩ টি সদস্য দেশের মধ্যে ১৪৮টি সদস্য দেশ । কিন্ত বস্তুত প্যালেসটাইন রাষ্ট্র পূর্বে ওয়েস্ট ব্যাংক (জর্ডন নদীর পশ্চিম পাড়ের ভূখণ্ড) এবং দক্ষিণ পশ্চিমে গাজা ভূখণ্ডে সীমিত। কিন্তু নামে প্যালেস্টিনীয় সার্বভৌমিক বলে থাকলেও কার্যত দুই জায়গাতেই ইজরায়েলি দখলদারীত্ব রয়েছে পূর্ণ মাত্রায়। এই দুই ভূখণ্ডের ইজরায়েলি কলোনি রয়েছে অন্তত ২১ টি এবং বসবাস কারী ইহুদী জনসংখ্যা ৭ লক্ষ। ওয়েস্ট ব্যাংকের তুলনায় গাজার অবস্থা আরো সংকটময়। কারণ ২০০৬ সালের ভোটে ফাতাহ্ গোষ্ঠীকে শাসকদের হটিয়ে হামাস গোষ্ঠী দখল নেয় গাজার। ফাতাহ্ গোষ্ঠীর দখলে এখনও রয়েছে ওয়েস্ট ব্যাংক। কিন্ত হামাস গোষ্ঠী মতাদর্শ গত ভাবে অনেক বেশী মৌলবাদী এবং চরমপন্থী। ফলতঃ ২০০৭ সাল থেকেই ইজরায়েলের সঙ্গে গাজা ভূখণ্ডে সংঘর্ষ বৃদ্ধি পায় বহুগূণ এবং ইজরায়েল সীমান্ত সুরক্ষার বাহানায় গাজা আর ওয়েস্ট ব্যাংকে আগ্রাসন জারী রাখে। দুই জায়গাতেই কোন স্থল বন্দর বা সমুদ্র বন্দর নেই । নেই কোন আকাশ সীমাও।সবটাই ইজরায়েলের দখলে। আমদানী / রফতানি ইজরায়েলের অনুমতি সাপেক্ষে। আভ্যন্তরীণ চাহিদার ৮০ শতাংশ বৈদেশিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। বিশ্ব খাদ্য সূচক অনুযায়ী জনগণের ৭২ শতাংশ অভুক্ত। দারিদ্র সীমার নীচে ৫০ শতাংশেরও বেশী মানুষ। জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশ মানুষের গড় বয়স ১৪ বছর। বয়স্ক পুরুষরা বেশিরভাগই যুদ্ধের বলি। বর্তমান যুদ্ধে ইজরায়েলের ঘোষিত নীতি বাইরে থেকে গাজার ভিতরে যেন কোনো খাদ্য, বস্ত্র, পানীয় জল বা স্বাস্থ্য পরিষেবা বর্ডার চেকিং ছাড়া না পৌঁছায়। রাষ্ট্র পুঞ্জের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠনকেও ইজরায়েল ছাড় দেয়নি। দিনের পর দিন খবরের কাগজের প্রতিবেদনে আর টিভির পর্দায় আমরা নির্বাক হয়ে দেখেছি -- খাবারের প্যাকেট আর জলের বোতলের জন্য অন্তহীন শীর্ণ, দীর্ণ মুখের মিছিল । হামাসের যোদ্ধারা লুকিয়ে আছে- এই অজুহাতে ইজরায়েল বেছে বেছে নিশানা করেছে স্কুল, হাসপাতাল আর ত্রাণ শিবিরে। আন্তর্জাতিক মহল মনে করে ইজরায়েল এই

মুহূর্তে গাজায় গণহত্যা চালাচ্ছে। ইজরায়েল বলে তাদের উদ্দেশ্য গাজাকে হামাস মুক্ত করা। সারা পৃথিবী যখন বলে যে গাজা আর ওয়েস্ট ব্যাংক আসলে ইজরায়েলের দখল করা এলাকা , ইজরায়েল তাতে কর্ণপাতও করে না । ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস ইজরায়েলের কাছে ব্যাখ্যা চেয়ে জানতে চেয়েছে কেন তাদের যুদ্ধাপরাধী বলা হবে না? জবাব দেওয়া জরুরি বলে মনে করে নি ইজরায়েল ।

অথচ ১৯৪৮ এর রাষ্ট্র পুঞ্জের সনদ, ১৯৮৮তে ইয়াসের আরাফতের নেতৃত্বে পিএলওর পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা বা ১৯৯৪ এর অসলো চুক্তির পর এইরকমটা হওয়ার কথা ছিল না। তবু এরকমটাই যে হল তার কারণ সাম্রাজ্যবাদের দুনিয়াজোড়া জাল আর ভূকৌশলগত রাজনৈতিক বিন্যাস। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি আর বৃটেনের নিজেদের স্বার্থেই, দরকার মধ্যপ্রাচ্যে সম্মিলিত আরব তথা ইসলামিক শক্তিকে টক্কর দেওয়ার, দরকার মধ্যপ্রাচ্য তেল ভান্ডারে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য। প্রত্যক্ষ মার্কিন মদতে ইজরায়েল সামরিক শক্তির বিচারে বিশ্বে পঞ্চম বৃহত্তম। তারা জানে যে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদ যা বলে বলুক, নিরাপত্তা পরিষদে তাদের বিরুদ্ধে আনা যে কোনো প্রস্তাব মার্কিন ভেটোতে নাকচ হয়ে যাবে।

কিন্তু আরব দুনিয়া? তারা কি সম্মিলিত ভাবে চেয়েছে প্যালেসটাইন প্রশ্নের স্থায়ী সমাধান? একমাত্র ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে ছয়টা আরব দেশ একসাথে লড়েছিলো।এক সপ্তাহের যুদ্ধ শেষে ইজরায়েল মিশরের থেকে গাজা (হ্যাঁ, গাজা তখন মিশরের দখলে ছিলো), জর্ডন থেকে ওয়েস্ট ব্যাংক আর সিরিয়ার থেকে গোলান হাইট্স কেটে নেয়। আজকের মধ্যপ্রাচ্যে আরব তথা ইসলামিক স্বার্থ টুকরো টুকরো হয়ে গেছে তীব্র শিয়া/সুন্নি বিতর্কে (গাজার ৯৯ শতাংশ মানুষ সুন্নি সম্প্রদায়ের), আরব/ অনারব গৃহযুদ্ধে। মধ্য প্রাচ্যের প্রতিটি দেশ গাজায় যুদ্ধ মেটাতে পা ফেলেছে খুব হিসেব কষে। ইরান ছাড়া প্রত্যেকের টিঁকি প্রত্যক্ষভাবে বাঁধা আছে মার্কিন স্বার্থের সাথে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে এরা আগ্রহী নয়। বিচ্ছিন্ন ভাবে এরা অনেকেই ইজরায়েলের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে আবদ্ধ (সৌদি আরব)। আজকের গাজায় অন্তত ১৭টা আরব ইসলামিক গ্রুপ নিজেদের মধ্যেই খেয়োখেয়ী করছে।কারোর সাথে কারোর মতের মিল নেই। সাধারণ মানুষ সম্পূর্ন বিভ্রান্ত। হামাসের মধ্যে তালিবানি প্রভাব স্পষ্ট ।২০১০সালেই এরা ফতোয়া এনেছিলো মেয়েদের হিজাব পরা আবশ্যিক। বামপন্থী দু'টি গ্রুপ ‘পপুলার ফ্রন্ট’ আর ‘ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট ফর লিবারেশন অফ প্যালেসটাইন’ এর কর্মীরা প্রায়ই হামাসের হাতে গুম খুন হয়ে যায়। সেজন্যই আজকের গাজায় যে যুদ্ধ চলছে তা প্রথম ইন্তিফাদা(১৯৬৭) বা দ্বিতীয় ইন্তিফাদার (২০০০) মত সমগ্র প্যালেসটাইনের আরবদের স্বাধীনতা যুদ্ধ নয়। দুর্ভাগ্য প্যালেসটাইনের, আজ তাদের আর একজন ইয়াসের আরাফত নেই যে এক ঝাণ্ডার নীচে সমগ্র প্যালেসটাইন কে ধর্মমত নির্বিশেষে এককাট্টা করতে পারে। কিন্তু তাতে প্যালেসটাইনি মানুষের মুক্তি আর স্বাধীনতার দাবী বিন্দু মাত্র ক্ষুন্ন হয়নি। বিশ্ব জুড়ে মুক্তিকামী মানুষ আজো নদী থেকে সাগর প্যালেসটাইন এর সাথেই পথ হাঁটছে।

(মতামত লেখকের নিজস্ব)

উদারনীতি ও নতুন জমানার শ্রমিক

গৌতম বসু

সংবাদপত্রে (৩/২/২০২৫) মধ্যবিত্তের জন্য আয় কর ছাড়ের খবর বেরিয়েছে ফলাও করে। ২০২৫-২৬ এর বাজেট প্রস্তাবে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ঘোষণা করেছেন এই কর ছাড়ের ব্যবস্থা। পাশাপাশি আর একটা খবর। তিনজন সাফাই কর্মী বা নর্দমা মেরামতির কাজে ১০ ফুট নিচে নেমে মারা গেছেন। ফরজেম শেখ, সুমন সর্দার ও হাসিবুর শেখ - বয়স যথাক্রমে ৫৮, ৩০ ও ৩০ বছর। বাড়ি মুর্শিদাবাদ। অর্থাৎ অন্তরাজ্য পরিযায়ী শ্রমিক।

নর্দমা সারাইয়ের স্থান বানতলা চামড়া শিল্পের সংলগ্ন। সুতরাং সেখানে বিষাক্ত রাসায়নিক ও মারণ গ্যাস থাকার সম্ভাবনা প্রবল। কিন্তু তাঁদের ছিল না গ্যাস নিরোধক মুখোস বা জরুরিকালীন জীবনদায়ী ব্যবস্থা। কাজটি করাচ্ছিল কে এম ডি এ নিযুক্ত ঠিকাদারি সংস্থা। মৃতদের ক্ষতিপূরণ বাবদ রাজ্য সরকার ১০ লক্ষ্য টাকা দেবে। কবে সেই টাকা তাঁদের পরিবারের হাতে পৌঁছবে ? জানা নেই।

শ্রমজীবী জীবনের দুঃখ দুর্দশা বঞ্চনা হাজির করা এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। পরিযায়ী নির্মাণ বা ইনফরমাল সেক্টরের শ্রমিকদের সাথে সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের (ইনফর্মেশন টেকনোলজি বা আই টি সহ) কি পার্থক্য তার প্রাথমিক অবতারণা করার জন্য এই প্রচেষ্টা।

ভারতবর্ষ এবং এই রাজ্যে শ্রমজীবী বর্গ বা শ্রেনীর মধ্যে মাসিক বা বার্ষিক আয়ের বৈষম্য বেড়েছে কয়েক গুন। যেমন ধরা যাক গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার বা জি সি সি প্রতিষ্ঠানগুলোতে কর্মরত শ্রমিকরা দুর্ঘটনায় মৃত শ্রমিকদের থেকে কয়েক গুন মাসিক বা বার্ষিক আয় করেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে জি সি সি কাদের বলা হবে ? আর তাদের কাজটাই বা কী?

গত নভেম্বরে (২০২৪) বাণিজ্য মন্ত্রকের এক ঘোষণা অনুযায়ী ভারতবর্ষ পরিষেবা রপ্তানী করেছে ৩৫.৭ বিলিয়ন ডলার। যা ৩২.১ বিলিয়ন ডলারের পণ্য রপ্তানির চেয়ে বেশি। এই জি সি সি কেন্দ্রগুলি হচ্ছে বহুজাতিক সংস্থাগুলির ভারতে স্থাপিত তথ্য উন্নয়ন ও গবেষণা কেন্দ্র। বিশ্বব্যাপী তথ্য জাল ও সরবরাহ জাল (সাপ্লাই চেইন) এই কাজকে সহজ করেছে। প্রায় ১৫০০ এই জাতীয় সংস্থায় এই মুহূর্তে ভারতে কর্মরত শ্রমিক বা বিজ্ঞানী বা উন্নয়ক (ডেভেলপার) এর সংখ্যা ৩২ লক্ষ। এই দেশের বিপুল পরিমাণ শিক্ষিত যুবা এই কর্মচারী বর্গের মধ্যে পড়েন। তাঁদের শ্রমিক বললে তাঁরা যারপরনাই ক্ষুব্ধ হবেন। তাঁদের জীবনযাত্রার মানের সাথে একজন সাধারণ শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানের বিস্তর ফারাক। এই সংস্থাগুলির সম্মিলিত রাজ্যের পরিমাণ ১০২ বিলিয়ন ডলার। স্বাভাবিক ভাবেই এই সংস্থাগুলোতে কর্মরত শ্রমিকদের মাসিক বা বার্ষিক আয় তাকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে ২ রা ফেব্রুয়ারি ২০২৫ এ মৃত শ্রমিকদের থেকে।

সরকারি সংস্থাগুলোতে কর্মরত শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে দেখা যাবে একই চিত্র। পাশাপাশি দুজন বসে একই কাজ করছেন বা দুজন সাফাই কর্মী পাশাপাশি একই কাজ করছেন। কিন্তু দুজনের রোজগার ও কাজের শর্ত ভিন্ন। সরাসরি নিযুক্ত সরকারি কর্মচারী ও ঠিকাদারের অধীনে নিযুক্ত কর্মচারী ভিন্ন মাস মাহিনা পান। ঠিকাদারের অধীনে নিযুক্ত কর্মচারী অবশ্যই অনেক কম মাহিনা পান।

এই মুহূর্তে আমাদের দেশে কর্মরত ইনফর্মেশন টেকনোলজি সেক্টরে কর্মরত শ্রমিক সংখ্যা ৫৪ লক্ষ্য। এই ক্ষেত্রকে নির্ভর করে অপ্রত্যক্ষ বিভিন্ন ধরনের পেশার সৃষ্টি হয়েছে। তা অসংগঠিত বা ইনফরমাল সেক্টরের অন্তর্গত। এঁরা প্রায় কোনো রকম আইনী সুরক্ষার অন্তর্গত নন। অন্যদিকে ইনফর্মেশন টেকনোলজি ক্ষেত্রে কর্মরত শ্রমিকদের বিভিন্ন অছিলায় কাজের সময় ৮ ঘণ্টা থেকে বেড়ে ১০ ঘণ্টা করার পরেও আরো বাড়াতে চাইছেন মালিকরা। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলো যখন সহায় তখন মালিকরা থুড়ি ম্যানেজমেন্ট সপ্তাহে ৭০ থেকে ৯০ ঘণ্টা কাজের ফরমান জারি করে জল মাপছেন।

সামাজিক মাধ্যমে তা নিয়ে তর্জা চলছে। অন্যদিকে সারাদিন কাজ করার (কোনো সময়সীমা নেই) পর একজন গিগ শ্রমিক কত মজুরি পাবেন তা নিয়ে কোনো সরকারি নির্দেশিকা নেই। বা শ্রমিকদের সমবেত প্রয়াস এখনো গড়ে ওঠেনি। নীতি (NITI) আয়োগ, যা কিনা পরিকল্পনা কমিশনের পরিবর্তে গড়ে উঠেছে, বলছে ২০২১-২২ সালে গিগ শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৭৭ লক্ষ্য। আর ২০২৯-৩০ নাগাদ এই সংখ্যা হবে ২ কোটি ৩৫ লক্ষ্য। এঁরা আগামীদিনে সম্পূর্ন নতুন এক শ্রমজীবী বাহিনী হিসেবে শ্রমিক আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে চলেছেন। গিগ শ্রমিক সম্পর্কিত এই তথ্য জানান কেন্দ্রীয় শ্রম প্রতিমন্ত্রী রাজ্য সভার এক প্রশ্নের উত্তরে গত ২৮ নভেম্বর ২০২৪ তারিখে।

শ্রমজীবী বর্গের সারিতে ১৯৯০ এর পর নতুন নতুন কাজের ক্ষেত্র নতুন নতুন শ্রমিক বাহিনী তৈরি করে চলেছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। যার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে পুঁজিবাদ বিরোধীদের নির্মাণ করতে হবে নতুন ধরনের শ্রমিক সংগঠন। যা পুরোনো শ্রমিক সংগঠন থেকে ভিন্ন ধরনের হতে বাধ্য। যার লক্ষ্য উদ্দেশ্য হয়তবা হবে অনেকবেশী পুঁজিবাদ বিরোধী রাজনীতির দ্বারা জারিত।

'অভয়া-কান্ড': আদালতের রায়

বিশ্বজিৎ হাজরা (সম্পাদকীয়)

গত ২১শে জানুয়ারি আর.জি.কর হাসপাতালে 'অভয়া'-র ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় বিচারপতি অনির্বান দাস তাঁর রায় ঘোষণা করেন। বিচারে অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করে 'আমৃত্যু কারাবাসের' সাজা দেওয়া হয়।

এটা ঠিক, যে নৃশংস 'অভয়া কান্ডের' পিছনে কোনও 'বৃহত্তর ষড়যন্ত্র' থাকার প্রমান মেলেনি। এটাও ঠিক, যে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনাটি অভিযুক্ত সঞ্জয় রায় একাই ঘটিয়েছে বলে আদালত নিশ্চিত। কিন্তু শুরু থেকেই গোটা ঘটনাটিকে 'ধামাচাপা দেওয়ার' চেষ্টা? আইন-রক্ষী পুলিশ-বাহিনীর 'বেআইনি' কার্যকলাপ? ঘটনাটিকে 'পর্দার আড়ালে' রাখার চেষ্টা? সে'সব নিয়ে আদালতের বক্তব্য কী?

১৭২ পাতা রায়টি খুঁটিয়ে পড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তবু যাঁরা আগ্রহী, তাঁরা ইন্টারনেট অথবা সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সহজেই পুরো রায়টি পড়তে পারেন। এই লেখায় আমরা কেবল বিচারপতির তুলে ধরা বিশেষ কিছু প্রশ্নকেই মানুষের সামনে হাজির করবো, যার কোনও উত্তর বিচারপতিও পাননি, সাধারণ মানুষও পায়নি।

বিচারপতি অনির্বান দাস তাঁর রায়ে বলেছেন, *'দায় এড়ানোর জন্য আর.জি.কর কর্তৃপক্ষ ঘটনাটিকে যে আত্মহত্যা হিসাবে দেখানোর চেষ্টা করেছিলো, সেই বিষয়ে কোনও সন্দেহই নেই।'* তিনি আরও উল্লেখ করেন, চারদিকে প্রতিবাদের জন্যই কর্তৃপক্ষের এই *'বেআইনি স্বপ্ন'* সফল হয়নি! সরকারি হাসপাতালের কর্তৃপক্ষ যদি হাসপাতাল চত্বরের মধ্যেই ঘটে যাওয়া বীভৎস একটি ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাকে 'আত্মহত্যা' বলে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে মানুষ আর কার ওপরে ভরসা রাখবে? পুলিশের ওপর? প্রশাসনের ওপর?

উঁহু! তারও উপায় নেই। রায়ে উল্লেখ করা হয়েছে, সাক্ষ্য-প্রমান থেকে দেখা যাচ্ছে যে টালা থানার সাব-ইন্সপেক্টর সুব্রত চ্যাটার্জী ৯ই অগাস্ট সকাল ১০.১০-টায় থানার রেকর্ড-বুকে 'অস্বাভাবিক মৃত্যুর' জেনারেল ডাইরি নথিভুক্ত করেছেন। কিন্তু সাক্ষ্য-প্রমান থেকে এটাও দেখা যাচ্ছে যে সুব্রত চ্যাটার্জী ওই সময় আদৌ টালা থানায় উপস্থিত ছিলেন না! অর্থাৎ সোজা কথায়, থানার একজন দায়িত্বশীল সাব-ইন্সপেক্টর 'ব্যাক-ডেটে' ডাইরি নথিভুক্ত করেছেন! সুব্রত ব্যানার্জী বলেছেন, 'আমাকে সেটাই করতে বলা হয়েছিলো'। কিন্তু কে বলেছিলো? নাঃ, তার কোনও সদুত্তর মেলেনি! শুধু তাই নয়। ৮ তারিখ রাত ১২.৪৫-এ ঘটনাটি ঘটে। রাত ২টোয় টালা থানায় ডেথ-সার্টিফিকেট জমা পড়ে। তার পরেও অভয়ার মা-বাবাকে কেন ৯তারিখ সন্ধ্যে ৬টা পর্যন্ত অভিযোগ লেখানোর জন্য বসিয়ে রাখা হলো, আদালত প্রশ্ন তুলেছে তা নিয়েও। সাধারণ মানুষ তাহলে থানার ওপরেই বা আস্থা রাখবে কি করে? খোদ বিচারপতিই তাঁর রায়ে লিখছেন, *'সাব-ইন্সপেক্টরের এই আচরণই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে ঘটনাটিকে কতটা উদাসীনতার সাথে থানা নিয়েছে ... আমার কিছুতেই বোধগম্য হচ্ছে না যে টালা থানার পুলিশরা কেন সবকিছু পর্দার আড়ালে রেখেছিলেন এবং কেনই বা এই ধরণের বেআইনি কাজ করেছিলেন!'* যে ধাঁধাঁ খোদ বিচারপতিরই বোধগম্য হয়নি, তা আর সাধারণ মানুষের মাথায় ঢুকবে কি করে!

আদালত টালা থানার ইন্সপেক্টর রূপালী মুখার্জীর কাজকর্মেও বিস্ময় প্রকাশ করেছে। বিচারপতি তাঁর রায়ে লিখেছেন, *'তিনি (রূপালী মুখার্জী) যেভাবে ৯ তারিখে অভিযুক্তর থেকে মোবাইলটি নিয়ে টালা থানায় অরক্ষিত ভাবে রেখে দেন, তা খুবই কৌতুহল-জনক ... তবে এটাও প্রমান হয়নি যে তিনি কোনও অসৎ উদ্দেশ্যে এই কাজ করেছেন অথবা মোবাইলের তথ্য নষ্ট করেছেন।'* হ্যাঁ, পুলিশ যে আসামীর মোবাইলের তথ্য নষ্ট করেছে, তার কোনও প্রমান মেলেনি। আবার এটাও ঠিক, যে থানার মধ্যে বসে সাক্ষ্যপ্রমান রেখে পুলিশ নিশ্চয়ই এই অপকর্মটি করবে না! খোদ বিচারপতির মনেই যদি এই নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, 'কৌতুহলের উদ্রেক হয়', তাহলে সাধারণ মানুষের উঠবে না?

মোটকথা, আর.জি.কর কান্ডে বিচারপতি অনির্বান দাসের রায়, ঘুণ-ধরা এই প্রশাসন সম্পর্কে বহু প্রশ্নকে সামনে এনেছে, যার প্রয়োজন ছিলো। আপাত-দৃষ্টিতে দেখলে, সমাজের 'উঁচু তলার একটি ডাক্তার মেয়ের' ধর্ষণ ও খুনের ঘটনাতেও প্রভাবশালী কর্তৃপক্ষ থেকে শুরু করে পুলিশ-প্রশাসন যে অমানবিক, অসংবেদনশীল ও সর্বোপরি বেআইনি আচরণ করেছে, তার থেকেই প্রমান হয়ে যায়, খেটে-খাওয়া ছাপোষা সাধারণ মানুষ অভিযোগ নিয়ে থানায় গেলে অথবা কর্তৃপক্ষের কাছে গেলে ঠিক কি ধরণের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হন! আর.জি.কর কান্ডের প্রতিবাদে লক্ষ-লক্ষ মানুষের 'জাস্টিস-আন্দোলন' শুধু অভয়ার জন্য সুবিচারই চায়নি, সুবিচার চেয়েছিলো 'যে রক্ষকরা নিজেরাই ভক্ষক', তাদেরও কঠোর শাস্তির দাবীতে। সমাজে 'প্রভাবশালীরা' যতদিন ক্ষমতায় বসে থাকবে, সেই সুবিচার তথা 'জাস্টিস' সহজে মেলার কথা নয়। 'জাস্টিস-আন্দোলন' তাই দীর্ঘজীবী হোক!

চারটি শ্রমকোড বাতিলের দাবি সোচ্চারে তুলতে হবে

কুশল দেবনাথ

২৯টি শ্রম আইনকে চারটি লেবার কোডে পরিণত করে আইন তৈরী করেছে বিজেপি পরিচালিত এনডিএ সরকার।এই আইন লাগু করা যাচ্ছিল না তার কারণ বিধি(rules)তৈরি হয়নি বলে।কারণ বিধি তৈরী না হলে কোন আইনকে কার্যকরী করা যায়না।পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের তিনটি রাজ্য বাদ দিয়ে সব রাজ্যই ইতিমধ্যে বিধি তৈরী করেছে।এর ফলেই কেন্দ্রীয় শ্রম দপ্তর ঘোষনা করেছে আগামী ১লা এপ্রিল ২০২৫ থেকে এদেশে শ্রমকোড লাগু করা হবে।প্রশ্ন হোলো পশ্চিমবঙ্গেও কি আইন লাগু হবে? হ্যা হবে,কারণ, শ্রম যেহেতু যুগ্ম তালিকাভুক্ত,তাই কেন্দ্রীয় সরকার নোটিফিকেশন করবে যে রাজ্যগুলি বিধি তৈরী করেনি,সেখানে কেন্দ্রীয় বিধি লাগু হবে।২০২০ সালে তিনটি কৃষি আইন ও চারটি শ্রমকোড লোক সভায় বিল আকারে পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু দূর্বার কৃষক আন্দোলনের জেরে কেন্দ্রীয় সরকার তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়।শ্রমকোডের বিরুদ্ধে গোটা দেশে বিভিন্ন ধরনের ট্রেড ধইউনিয়ন প্রতিবাদ করেনি এমনটা নয়।কিন্তু সেই প্রতিবাদের ধার অনেক কম ছিল।শ্রমিক আন্দোলনের দূর্বলতার জন্যই আজ গোট দেশে শ্রমকোড লাগু হতে চলেছে।

প্রশ্ন আসে, বিভিন্ন সময় আমাদের দেশে যে শ্রম আইন এসেছিল, তার সাথে এই চারটি শ্রমকোডের পার্থক্যটা কি? এযাবৎ কালে যে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে শ্রম আইন এসেছিল, তার প্রত্যেকটিরই আলাদা আলাদা উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু এই শ্রমকোডে ভিন্ন ভিন্ন আইনকে একটা সূত্রে গেঁথে দিয়েছে।তাই প্রতিটা আইনের যে ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল তা তুলে নেওয়া হয়েছে।একটু উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যাক।১৯৭০সালে যখন কন্ট্রাক্ট লেবার (রেগুলেশন ও অ্যাবোলিশন)আইন আসে তার উদ্দেশ্য ছিল ঠিকা শ্রমিকদের কাজ নিয়মিত করা ও ঠিকা প্রথার অবসান ঘটানো।যদিও ঐ আইনে অ্যাবোলিশনের কোনো কথা লেখা হয়নি।তবু এই উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছিল। এবারে অক্যুপেশনাল সেফটি,হেল্থ এবং ওয়ার্কিং কনডিশন শ্রমকোড২০২০তে কন্ট্রাক্ট লেবারের বিষয়টা অন্তর্ভুক্ত করা হোলো।ফলে ঠিকা শ্রমিকদের ১৯৭০ সালের মূল আইনের তাৎপর্যই হারিয়ে গেল।আমরা দেখি এই কোডের বিষয়টির উদ্দেশ্যই লেখা আছে,পেশাগত

নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও কাজের অবস্থা নিয়ে এই কোড।সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে শ্রম আইন তৈরী হয়েছিল, তার মূল উদ্দেশই এই কোডে বাতিল করা হয়েছে।

এবার আরও একটা বিষয় আলোচনা করা দরকার।আমরা যদি চারটি শ্রমকোডকে খুঁটিয়ে পড়ি,দেখবো এই কোডগুলির উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রমিক শ্রেনীকে টুকরো টুকরো মানুষে পরিবর্তিত করা।পূঁজিবাদের শুরুর পর্যায়ে শ্রমিক ছিল 'ক্লাস ইন ইটসেল্ফ'।কিন্তু ধারাবাহিক লড়াইয়ের মাধ্যমে শ্রমিকরা 'ক্লাস ফর ইট সেল্ফ' অবস্থানে পৌঁছয়।এই লেবার কোডে এমন অনেক বিষয় যুক্ত করা হয়েছে যেখানে শ্রমিকরা 'শ্রেনী' সত্বা থেকে 'ব্যক্তি' সত্বায় পরিবর্তিত হবে।অর্থাৎ পূঁজির হামলার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে শ্রমিকশ্রেনীর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারবেনা।এছাড়াও এই শ্রমকোডের আরো একটি তাৎপর্য রয়েছে, তাহলো এমনভাবে এই এই কোড তৈরি করা হয়েছে যাতে বেশিরভাগ শ্রমিকই শ্রম আইনের আওতার বাইরে চলে যাবে।একটু উদাহরণ দিয়ে বলা যাক- ১৯৭০ সালে কন্ট্রাক্ট লেবার(রেগুলেশন ও অ্যাবোলিশন) এ্যাক্টে ২০জন শ্রমিক ঠিকাদারের অধীনে কাজ করলে আইনী অধিকার পেতো।এই শ্রমকোডে সংখ্যাটা ৫০ করে দেওয়া হয়েছে।ফলে একজন কন্ট্রাকটর৪৯জন শ্রমিককে নিয়েকাজ করলে আইন তাকে ছুঁতেও পারবেনা।আর বিভিন্ন কোম্পানিতে ঠিকা শ্রমিকরা একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় কাজ করে,সেই সংখ্যাটা মাত্রাতিরিক্ত হয়না।উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন জায়গায় প্রধানতঃ নানান ধরনের ঠিকাদার কাজ করে। একজন ঠিকাদার নয়। সুতরাং নতুন লেবার কোডে বেশিরভাগ ঠিকা কর্মীকে শ্রম আইনের বাইরেও নিমে আসা হোলো। ফলতঃ কন্ট্রাকটর কিংবা মূল কর্তৃপক্ষ যথেচ্ছভাবে শ্রমিকদের ওপর আক্রমণ নামানোর চেস্টা করবে।

এই শ্রমকোডগুলিতে শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার অর্থাৎ ধর্মঘট করার অধিকার সুকৌশলে কেড়ে নেবার চেস্টা হয়েছে।কেড়ে নেওয়া হয়েছে ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্বহালের বিষয়টিও।কারখানার স্থায়ী শ্রমিক প্রথার অধিকার তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। শুধু ঠিকা শ্রমিক নয়,অন্য একটা বিরাট অংশের শ্রমিককেও লেবার আইনের আওতার বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এই শ্রমকোডে ফ্যাক্টরীর সংজ্ঞাও পাল্টে দেওয়া হয়েছে।এতদিন ফ্যাক্টরীর সংজ্ঞা ছিল 'যে প্রতিষ্ঠানে বিদ্যুৎ সহ ১০জন শ্রমিক কাজ করে,অথবা বিদ্যুৎহীন প্রতিষ্ঠানে ২০ জন শ্রমিক কাজ করলে তা ফ্যাক্টরীর মর্যাদা পাবে।এবং এই আইনের সুবিধা পাবে।কিন্তু শ্রমকোডে ফ্যাক্টরীর সংজ্ঞা বদলে শ্রমিক সংখ্যা পূর্বের আইনের দ্বিগুণ করা হয়েছে।অর্থাৎ যে কারখানাতে বিদ্যুৎ সহ ২০জন শ্রমিক কাজ করে তারা শ্রমিকের মর্যাদা পাবে।আর বিদ্যুৎহীন অবস্থাতে ৪০জন থাকতে লাগবে। এর ফলে বিপুল সংখ্যক শ্রমিকদের আইন স্বীকৃত কোনো সুবিধা থাকবেনা।এক কথায় , এক বিপুল সংখ্যক শ্রমিককে শ্রম আইনের বাইরে নিয়ে যাবে এই শ্রমকোড। এই কোড শ্রমিকদের টুকরো মানুষে পরিণত করবে, সংগ্রাম ও সংগঠন করার অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেস্টা হচ্ছে। এই কোড বাতিলের লড়াই ছাড়া ,অন্য কোনো রাস্তা খোলা নেই এদেশের শ্রমিকশ্রেনীর কাছে।(চলবে)

আমেরিকার রাষ্ট্রক্ষমতায় আবার ট্রাম্প

শ্রীধর

২০২৪ এ আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিপুল ব্যবধানে জয়ী হন ট্র্যাম্প । সংসদের দুই সদনেও রিপাবলিকানরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে । ২০০৮ এর অর্থনৈতিক সঙ্কটের পর বিভিন্ন দেশের মত আমেরিকাতেও ট্রাম্পের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হয়েছে আমেরিকার অতি-দক্ষিনপন্থীরা ।

রাষ্ট্রপতি পদে শপথ গ্রহণের সময় ট্রাম্পকে এলন মাস্ক, জেফ বেজস, জুকেরবারগ, মুকেশ আম্বানি, সুন্দর পিচাই এর মত ধনকুবেরদের দ্বারা আবৃত থাকতে দেখা গেছে । এলন মাস্ককে সরকারের উপদেষ্টা পদে নিয়োগ করা হয়েছে । নির্বাচনের সময় ট্রাম্পের প্রচারে বিপুল অর্থপ্রদানই নয় সরাসরি তার হয়ে প্রচার করতে দেখা গেছে মাস্ককে । বোঝা

যাচ্ছে যে পর্দার আড়াল থেকে নীতিনির্ধারণ নয়, নগ্নভাবেই নিজেদের স্বার্থে সরকারকে নিয়ন্ত্রন করতে চাইছে বিশ্বের হাতে গোনা কয়েকজন ধনকুবের । আমাদের দেশেও দেখা গেছে নির্বাচনী বন্ডের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ কর্পোরেটরা দিয়েছে শাসক শ্রেণির দলগুলোকে । মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে শিল্পপতিদের আঁতাত আরও স্পষ্ট হয়েছে আমাদের কাছে । সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলোতে আরও কাটছাঁট করা, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে সরকারি ব্যয় হ্রাস, বাজারের উপর সরকারি নিয়ন্ত্রন আরও কমানোর মত পদক্ষেপ আগামীদিনে নেওয়া হবে তার পূর্বাভাস স্বয়ং ট্রাম্পই দিয়েছেন । বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে ডলারের একাধিপত্যের সুযোগে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী প্রকল্পের স্বার্থে বিভিন্ন দেশের উপর অর্থনৈতিক অবরোধের হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে । আন্তর্জাতিক কর্পোরেটদের মুনাফার স্বার্থে আমেরিকা সহ দুনিয়ার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের উপর শোষণ আরও তীব্র হওয়ার আশঙ্কা আগামীদিনে ।

বিশ্বের অন্যান্য দক্ষিনপন্থী শক্তির মতই সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে মেরুকরনের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে ট্রাম্প ও তার অনুগামীরা । 'আমেরিকা ফার্স্ট' প্রচারের মাধমে অন্য দেশ থেকে আগত মানুষদের উপর ঘৃণা, হিংসার ঘটনা ঘটে চলেছে । জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব এর শতাব্দী প্রাচীন অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে । কাজের সূত্রে আমেরিকায় পারি জমানো মানুষদের ফেরত পাঠানোর হুমকি দেওয়া হচ্ছে, অথচ এই মানুষগুলিই তাদের শ্রম দিয়ে আমেরিকা চালান । শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠতার মত ভ্রান্ত প্রচারের মাধমে অশ্বেতাঙ্গ মানুষদের উপর আক্রমণ বাড়ছে ।ঐতিহাসিকভাবে বর্ণ, লিঙ্গ ও অন্যান্য পরিচিতির কারণে যারা শোষণের শিকার হয়েছেন তাদের যেটুকু আইনি অধিকার ছিল তা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে ।

বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের আঁচ যখন দুনিয়ার প্রতিটি মানুষ উপলব্ধি করতে পারছেন, তখন ট্রাম্প প্যারিস জলবায়ু চুক্তি থেকে আমেরিকাকে সরিয়ে নিচ্ছেন, বলছেন আগামিদিনে আরও বেশি খনিজ তেল, গ্যাস খননের কাজ চলবে । শিল্পবিপ্লবের সুফল যুগ যুগ ধরে ভোগ করেছেন ইউরোপ, আমেরিকার কয়েকটি দেশের ধনীরা, অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত খরা, বন্যা , ঘূর্ণিঝড়ের ফলে জীবন জীবিকা হারিয়েছেন আফ্রিকা, এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ । এদের একটা অংশই আমেরিকায় পাড়ি জমান কাজের খোঁজে, এবং অবৈধ অভিবাসী তকমা পান, এবং অধিকারহীন মজুরের মত জীবন কাটান ।

দেশে দেশে অতি-দক্ষিনপন্থী শক্তির উত্থানে সমাজ জুড়ে তৈরি হওয়া সংঘর্ষের পরিস্থিতিতে সংখ্যালঘুদের উপর হিংসা বেড়েছে, মেহনতি জনগণের যেটুকু অধিকার ছিল তা সংকুচিত হয়েছে। লাভবান হয়েছে বিভিন্ন দেশের হাতেগোনা ধনীরাই । অতি-দক্ষিনপন্থী শক্তিগুলোর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ মেহনতি জনতার লড়াকু সংগ্রাম ছাড়া খেটে খাওয়া মানুষের স্বার্থ সুরক্ষিত হতে পারে না।

'গাজা দখলের হুঙ্কার ট্রাম্পের- চাই দুনিয়া জুড়ে প্রতিবাদ

আভাষ মুন্সী

সদ্য আমেরিকার নির্বাচনের পূর্বে ট্রাম্প যে স্লোগান তুলেছিলেন তা হোল "আমেরিকা আবার মহান হবে" বা "Make America great again" । মহান করে গড়বে কে / ট্রাম্প ছাড়া আবার কে ! আর এই স্লোগানে গলা মিলিয়েছেন এলন মাস্ক - দুনিয়ার এক নম্বর ধনী। যিনি একাধারে শিল্পপতি, মিডিয়া টাইকুন বা প্রচার মাধ্যমের মালিক। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ৩৪৩ বিলিয়ন ডলার। অর্থাৎ প্রায় ২৯ লক্ষ ৮১ হাজার কোটি টাকা। এহেন মাস্ক মশায় যখন ট্রাম্পের হয়ে মাঠে নেমেছিলেন তখন তাঁরা যে দুনিয়ার মজুরদের বা সাধারণ নাগরিকদের মুশকিল আসন করবেন একটা পাগলেও ভাববে পারবেন না।

আজ ট্রাম্প ক্ষমতায় বসতে না বসতেই একদিকে "বেআইনি" নাগরিকদের যেমন জবরদস্তি বিভিন্ন দেশে ফেরৎ পাঠাচ্ছেন,পাশাপাশি প্যালেস্তাইনের প্রধানমন্ত্রী নেতাইয়াহুকে পাশে বসিয়ে হুঙ্কার দিচ্ছেন গাজা দখলের!যেখানে সদ্য রাস্ট্রপুন্জের মধ্যস্থতায় যুদ্ধ বিরতি ও বন্দী প্রত্যর্পন কার্যকরী হওয়া শুরু হয়েছে।একটা আপাত শান্তি প্রতিষ্ঠার বাতাবরণ সবে শুরু হয়েছে।ঠিক তখন এই হুঙ্কারের মধ্য দিয়ে পৃথিবী জোড়া অস্থিরতা নতুন করে তৈরী করতে চাইছেন।

আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী 'একটি এলাকা থেকে সমস্ত অধিবাসীদের একলপ্তে অন্য এলাকায় সরানো যায়না'। ট্রাম্প ঠিক তার ১৮০ ডিগ্রি বিপরিতে গিয়ে এ এক ভয়ঙ্কর কথা বলে গাজা দখলের পরিকল্পনা করছেন।এর বিরুদ্ধে হাবাস যেমন বিরোধ করেছে,সাথে সাথে সৌদি আরব,চিন,অস্ট্রেলিয়া সহ বিভিন্ন দেশ থেকে তাদের রাস্ট্র প্রধানরা তীব্র বিরোধিতা জানিয়েছে।বিরোধিতা করেছে আমেরিকার যুদ্ধের সহযোগীরাও।

আজকে পূজির সংকটের কালে যুদ্ধবাজ ট্রাম্প নতুন নতুন অস্থিরতা তৈরী করে,তার সাথে মেকী উন্নয়নের কথা বলে একটা গোটা জাতিকে তার জন্ম স্থান থেকে উচ্ছেদ করার হুঙ্কার ছেড়ে, নয়া ফ্যাসিবাদকে এক নতুন উচ্চতায় দাঁড় করাতে চাইছে।যার বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে এর কুপ্রভাব দ্রুতই ছড়িয়ে পড়বে।এই হুঙ্কার বিশ্বের সাধারণ নাগরিক ও শ্রমজীবীদের ওপর চলমান শোষন-জুলুমের বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ নয়।এশুধুই আরো ক্ষমতা ও পূজির সূদুর প্রসারিত সংকট থেকে মুক্তির প্রাণপন চেস্টা।যার বিরুদ্ধে রাস্তায় -ময়দানে নেমে শ্রমজীবী ও আপামর বিশ্ববাসীর বুঝে নেওয়া অবশ্য কর্তব্য।

মারুতি সুজুকি-র অস্থায়ী শ্রমিকদের মানেসর অভিযান

সংহতিতে কলকাতায় মিছিল

প্রায় চার মাস ধরে মারুতি সুজুকি-র অস্থায়ী শ্রমিকেরা ধরনা দিচ্ছেন। তাদের দাবি ২০১১-১২র আন্দোলনে অন্যায়ভাবে ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের কাজে ফেরাতে হবে। স্থায়ী কাজ ও মূল উৎপাদনের কাজ ঠিকা শ্রমিকদের দিয়ে করানোর পলিসি বন্ধ করতে হবে। ফিক্সড টার্ম নিয়োগ তথা 'ইউজ এন্ড থ্রো' পদ্ধতিতে শ্রমিকদের খাটানো যাবে না।

এই অস্থায়ী শ্রমিক কারা? বিভিন্ন টেকনিকাল/পলিটেকনিক ডিগ্রি ধারী যুবরা যারা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে নানান সময়ে মারুতিতে কাজ করেছে বা এখনো করছে। কোম্পানি নামমাত্র মজুরিতে কাজ করিয়ে যখন তখন তাদের বের করে দেয়। মূল্যহীন সার্টিফিকেট হাতে ধরিয়ে দেয়। যা নিয়ে দিনের পর দিন এক কারখানা থেকে অন্য কারখানা ঘুরে বেড়ানো ছাড়া রাস্তা থাকে না। বিভিন্ন গালভরা নামের পোস্ট, কিন্তু সবকটারই চরিত্র একই রকমের। মারুতির মোট শ্রমিকের প্রায় ৯০শতাংশই অস্থায়ী শ্রমিক। কোম্পানির কোনও দায় নেই এই সব শ্রমিকদের বর্তমানের প্রতি, বা ভবিষ্যতের প্রতি। এমন এক নিয়োগ ব্যবস্থা, যা বেকারত্বেরই অন্য পিঠ বলা যায়। এরই বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলছেন মারুতির অস্থায়ী শ্রমিকেরা।

গত ৭ই জানুয়ারি গুরগাঁওয়ে কয়েক হাজার শ্রমিকের জমায়েত হন। তারা গড়ে তোলেন 'মারুতি সুজুকি অস্থায়ী মজদুর সঙ্ঘ'। এরপর গত ৩০শে জানুয়ারি তারিখে 'মানেসর চলো'র ডাকও দেওয়া হয় এই জমায়েত থেকে। বিরাট সংখ্যক অস্থায়ী শ্রমিক এই অভিযানে সামিল হওয়ার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসেন। জমায়েতের কদিন আগে থেকেই প্রশাসন আপ্রাণ চেষ্টা করে যায় এই অভিযান কীভাবে বানচাল করা যায়। হুমকি, হুঁশিয়ারি, অনুমতি না দেওয়া কোনও কিছুই বাকি রাখে না তারা। শেষমেশ আদালতের দ্বারস্থ হয়ে শ্রমিকেরা জমায়েত ও মানেসরের মারুতি সুজুকি-র

কারখানা অভিযানের অনুমতি ছিনিয়ে আনেন। তা সত্ত্বেও ৩০শে জানুয়ারি সকাল থেকেই হরিয়ানা পুলিস শ্রমিকদের ওপর লাগাতার আক্রমণ চালিয়ে যায়। নেতৃত্বকারী অংশকে সকালে আটক করে, ধরনা মঞ্চ ভেঙে দেয়। বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিকদের জটলা করতে দেখলেই তুলে নিয়ে যায়।

এরই মধ্যে, এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়ে কলকাতায় সংগ্রামী শ্রমিক সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে সেই দিনই হয় বিক্ষোভ মিছিল ও মারুতি সুজুকি-র অফিস অভিযান।

বানতলায় ম্যানহোল পরিস্কারের সময় ৩ শ্রমিকের মৃত্যু: নিরাপত্তা কোথায়?

জয়দীপ

গত ২ ফেব্রুয়ারি, রবিবার, কলকাতার বানতলা চর্মনগরীতে ম্যানহোল পরিস্কার করতে গিয়ে মৃত্যু হল তিন শ্রমিক— ফরজেম শেখ, হাসি শেখ ও সুমন সর্দারের। রাসায়নিক বর্জ্য পরিষ্কারের সময় পাইপলাইন ফেটে ১০ ফুট গভীর নালায় পড়ে যান তাঁরা। চার ঘণ্টা পর তাঁদের মৃতদেহ উদ্ধার হয়।

২০১৩ সালে ম্যানুয়াল স্ক্যাভেঞ্জিং নিষিদ্ধ করা হলেও বাস্তবে তা মানা হয় না। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ এবং NAMASTE প্রকল্পের গাইডলাইন অনুসারে, ম্যানহোলে নামার আগে শ্রমিকদের সম্পূর্ণ সুরক্ষা সরঞ্জাম সরবরাহ করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু বাস্তবে ঠিকাদাররা অধিক মুনাফার জন্য শ্রমিকদের সুরক্ষা ব্যবস্থা না রেখেই কাজ করায়। প্রশাসনও নজরদারির দায় এড়িয়ে যায়।

এই দুর্ঘটনার জন্য কলকাতা কর্পোরেশন ঠিকাদারের ঘাড়ে দায় চাপাচ্ছে, অথচ প্রকৃত নিয়োগকারী হিসাবে তাদেরই শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব ছিল। ফিরহাদ হাকিমের মন্তব্য, শ্রমিকরা সুরক্ষা ব্যবস্থা না নিয়েই নেমেছিলেন, যা দায়িত্ব এড়ানোর প্রচেষ্টা।

২০২১ সালে কুদঘাটে একই ধরনের দুর্ঘটনায় ৩ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছিল, কিন্তু তাঁদের পরিবার আজও ক্ষতিপূরণ পায়নি। এবারও মৃতদের পরিবারকে ১০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করা হলেও বাস্তবে তারা সেই সুবিধা পাবেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য কর্পোরেশনকে স্থায়ী নিয়োগ চালু করতে হবে এবং ঠিকাদারি ব্যবস্থার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে। সরকারের এই চরম উদাসীনতার কারণে বারবার শ্রমিকদের প্রাণ দিতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতির পরিবর্তন দাবিতে গত ৫ তারিখ বিভিন্ন সংগ্রামী ট্রেড ইউনিয়নের ডাকে ধর্মতলায় প্রতিবাদ সভা করা হয়।

মমতার শিল্প সম্মেলন -- ধোঁকাবাজির নতুন রূপ

কুশল দেবনাথ

এক বছর তিন মাস আগে মমতা ব্যানার্জি বার্সেলোনা তে বিরাট টীম নিয়ে গিয়েছিলেন। কে ছিলো না সাথে!! সৌরভ গাঙ্গুলি,তিন প্রধান ক্লাবের কর্মকর্তা, মমতার নতুন ভক্ত বইমেলার দুই জুটি সুধাংশু দে, ত্রিদিব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। সরকারী টাকা মানে জনগণের কষ্ট উপার্জিত আয়ের উপর করের টাকা অপচয়। তো সেই বার্সেলোনা থেকে ঘোষণা হলো সৌরভ গাঙ্গুলি টি এম টি ষ্টীলের পক্ষ থেকে শালবনীতে ৬০০ একর জমিতে ২৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। ইস্পাত কারখানা হবে। প্রত্যক্ষভাবে ৬০০০ লোক চাকরি পাবে।অপ্রত্যক্ষ ভাবে আরও বহু।বলা হলো ৬ থেকে একবছরের মধ্যে কারখানা চালু হবে। ২০২৫ সালের শিল্প সম্মেলনে কি রিপোর্ট আমরা পেলাম। জমি নেই, একটা ইঁটও পড়েনি কারখানার জন্য।এবারের সম্মেলনে সৌরভ গাঙ্গুলি বললো ক্ষুদ্র শিল্পে বিনিয়োগ করবে। ইস্পাত শিল্প নিয়ে একটা কথাও বলেনি। এই হচ্ছে মমতার শিল্পায়ন নীতি। ফাটা কলসির আওয়াজ বেশী কার্যকারিতা কম।

২৩ শে সেপ্টেম্বর ২০২৩ শিল্প সম্মেলন নিয়ে মমতা বলেছিলেন, এত সফল কর্মসূচি খুব কম দেখেছি। এবার ২০২৫ এ বলেছেন ২০০র বেশী বিদেশি প্রতিনিধি, সব বড় শিল্পপতি এসেছে, এটা একটা অনন্য কর্মসূচী। মমতা আরো বলেছে এই রাজত্বে ১২ লাখ কোটি র বেশী বিনিয়োগ হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন আসে কর্মসংস্থান কতো হয়েছে? বেশীরভাগ টাই সৌরভ গাঙ্গুলির মতো "বিনিয়োগ" নয়তো। ১২ লাখ কোটি টাকা বিনিয়োগ হলে প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে কয়েকলাখ কর্মসংস্থান হবে। মমতা সরকার তো কোন তথ্য এই বিষয়ে দেয়নি। পশ্চিম বঙ্গের শ্রম দপ্তর লেবার ইন ওয়েষ্ট বেঙ্গল প্রকাশ করতো।এখন সব বন্ধ। আর এই সরকার কোনো তথ্য দেয়না। সব বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে মমতার মুখের কথাই সব। কেউ প্রশ্ন করার সাহস পায়না।

তথ্য পরিসংখ্যানের পরেও একটি বিষয় হলো সাদা চোখে কর্মসংস্থান ঠিক কতটা। বিগত শতকের পাঁচ ও ছয়ের দশকে বিভিন্ন শিল্পাঞ্চল গড়ে ওঠে এই রাজ্যে। হাইড রোড-তারাতলা-গার্ডেনরিচ , উলুবেড়িয়া, ব্যারাকপুর ,আসানসোল-দুর্গাপুর - কল্যানী ইত্যাদি। যদি প্রচুর কর্মসংস্থান হয় তাহলে এ রাজ্য থেকে হাজার হাজার মানুষ কাজের জন্য বাইরে যাচ্ছে কেন? হাজার কারখানা বন্ধ। শিল্পাঞ্চল গুলো শুকিয়ে গেছে খোলেনি কোন বন্ধ কারখানা। শুধু শিল্পপতি দের এনে মিথ্যাচার করা। জিন্দলদের ইস্পাত কারখানা হয়েছে নাকি? আর শিল্পায়ন মানে কি কিছু বড় পুঁজিপতির বিনিয়োগ। শিল্পের মূল শক্তি শ্রমিকরা। সেই শ্রমিকদের কাজের অবস্থা কি? একটি উদাহরণ দিই। ধূলা গড়ে কিছু হোসিয়ারি,কটন কারখানা হয়েছে। ওখানে একটা বড়ো অংশ নারী শ্রমিক। ১২ ঘন্টা ভীষন পরিশ্রম করেও তাদের দৈনিক আয় ২৫০-৩০০টাকা। কোন সুরক্ষা নেই। এটা কি শিল্পায়ন! একজন শিল্পপতি বলেছে এই রাজ্যে ধর্মঘট নেই। তাই শ্রমদিবস নষ্ট হয়না। গত কয়েকবছরে কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য অনুযায়ী সবচেয়ে বেশী শিল্পায়ন হয়েছে তামিলনাড়ু তে। আর কেন্দ্রীয় শ্রমদপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী সবচেয়ে বেশি ধর্মঘট হয়েছে তামিলনাড়ু তে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। সাত বছরের শিল্প বানিজ্য সম্মেলনে প্রতিবারই এসেছে মুকেশ আম্বানি। প্রতিবারই আসে। বক্তব্য রাখে। এবার বাংলার কাঁথাষ্টিচ,বালুচরি প্রতিটি ব্র্যান্ডের পণ্য কে রিলায়েন্স নামে বিক্রি করবে আম্বানি। কমদামে কিনে রিলায়েন্স ব্র্যান্ড মেরে প্রচুর মুনাফা করবে রিলায়েন্স। বাংলার কাপড়ের দোকানে বিক্রি কমবে। এরাজ্যের মানুষ কেও বেশী দামে কিনতে হবে।মুকেশের প্রচুর প্রশংসা তে বিগলিত মমতা ছাড়পত্র দিয়ে দিয়েছে।এই শিল্প সম্মেলন বড় পুঁজিপতি দের সমস্ত সুবিধা পাইয়ে দেবার সম্মেলন। সাধারণ শ্রমজীবী দের স্বার্থ বিরোধী এই সম্মেলন। শেষ করি অন্য একটা বিষয় দিয়ে। মুকেশ আম্বানি বক্তব্য রাখার সময় বলেছে মমতা ব্যানার্জি তাকে বলেছে উনি রোজ ৬৪০০০ ষ্টেপ হাঁটেন। অবাক চোখে জিন্দাল বলে সপ্তাহে? মমতা উত্তর দেয় -- না, দিনে।

দেখার বিষয় ঐ দুই একচেটিয়া শিল্পপতি কিভাবে এটা হজম করে।

বইমেলায় প্রতিবাদী বিক্ষোভ

কলকাতার বইমেলায় এক ধর্মনিরপেক্ষ উৎসব। এখানে বই কেনার সাথে নানা প্রতিবাদী সভা । মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণা তে গিল্ড কর্তৃপক্ষ সবধরনের সভা, মিছিল আটকাতে থাকে।আর জি কর কান্ডেল সময় এই দ্রোহের সময় বইমেলা তে কোন প্রতিবাদ হবে না মানা যায়না।এমনকি পোষ্টার ঢুকতে দেওয়া হচ্ছিল না।তবু কিছু ব্যক্তি, লিটল ম্যাগাজিন ও মানবাধিকার সংগঠনের উদ্যোগে মানববন্ধন ও শ্লোগান দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহন হলো।৯ ই ফেব্রুয়ারি বইমেলার শেষ দিনে বইমেলা প্রতিবাদে উত্তাল হয়। বইমেলার প্রতিবাদী চরিত্র অটুট রইলো।

গার্গীর লেখা। পরের সংখ্যায় যাক।

২০২৪ সালের ৯ই আগস্টের স্মৃতি এখনও পশ্চিমবঙ্গবাসীর চোখে জ্বলজ্বল করছে। তারপর কেটে গেছে অনেক কটা মাস, মিছিল আন্দোলনে মুখরিত হয়েছে গোটা শহর। তবে এর মধ্যে সব থেকে বড় মনে হয় ১৪ই আগস্টের মেয়েদের রাত দখল আন্দোলন, যা ছড়িয়ে পড়েছিল এই রাজ্যের প্রতিটা আনাচে কানাচে। এই দেশ তথা রাজ্য জুড়ে পরপর ধর্ষণ খুনের ঘটনা ঘটলেও কোনও একটা ভাবে আপামর সাধারণ মেয়েরা এই ঘটনার সাথে নিজেদের জুড়তে পেরেছিল। বোধহয় তার একটা বড় কারণ মেয়েটি ডাক্তার, এবং ডিউটি করছিল অর্থাৎ কর্তব্যরত অবস্থায় তার সাথে ঐ নারকীয় ঘটনা ঘটে; দ্বিতীয় কারণ ঘটনাস্থল ছিল হাসপাতাল যা আমাদের সবার চোখে অত্যন্ত নিরাপদ জায়গা। হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স, রোগী- তার আত্মীয়স্বজন সবাই নির্দ্বিধায় বিনা চিন্তায় রাতের পর রাত কাটাতে পারত সেখানে যদি এমন ঘটনা ঘটে তাহলে বাকি কোনও পরিসরই তো নিরাপদ নয়। তাহলে যেসব মেয়েরা নাইট ডিউটি করে, বা কাজ থেকে রাত করে বাড়ি ফেরে বা ভোরবেলা কাজে যায় তাদের সবার নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে পড়ে গেল। উপরন্তু আর জি করের অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এই ঘটনার পরে বলেছিল অটো রাতে মেয়েটি সেমিনার রুমে কেন গেছিল। এতে আরও আগুনে ঘি পরে। কর্মরতা মেয়েদের পাশাপাশি স্কুল ছাত্রীর মা, মধ্যবিত্তর পাশাপাশি শ্রমজীবী মহিলারা আপামর এই ঘটনার সাথে নিজেদের জুড়ে নেয় তৎক্ষণাৎ যে তাহলে তো আমার চলাচলের কোনও নিরাপদ জায়গা বা পরিসর নেই। সব জায়গাতেই বিরাজ করছে ভয়। তার সাথে আজন্ম হয়ে আসা বিভিন্ন বৈষম্যের ঘটনা, যৌন হেনস্থার ঘটনা সব কিছুকে সে এই আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদের সাথে জুড়ে ফেলতে চায়, এই প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে পরাধীনতার শিকল ভেঙ্গে সে নতুন স্বাধীনতা লাভ করতে চায়। এমনিতেই সন্ধ্যার পর থেকে মেয়েদের রাস্তায় বেরনো অনেক জায়গাতেই বন্ধ হয়ে যায়, বা খারাপ নজরে দেখা হয়। এমনকি মেয়েরা যাতে স্বচ্ছন্দে রাস্তাঘাটে বেরোতে পারে সেই পরিকাঠামোরও বিরাট পরিমাণ অভাব। অধিকাংশ রাস্তাঘাটে ঠিকঠাক আলোর ব্যবস্থা নেই, নেই রাস্তাঘাটে সুলভ শৌচাগার, আবার থাকলেও তা রাত ৯টার মধ্যে বন্ধ হয়ে যায়, গণ পরিবহনের অবস্থা তথৈবচ যত রাত বাড়ে তত তার সংখ্যা কমে। আর এই সমস্যাগুলি আপামর সমস্যা। তাই ১৪ই আগস্ট শহরের প্রতিটি মোড়ে, জেলা সদরে জমা হওয়া ৫০-৬০ হাজার মানুষের মধ্যে মূলত সংখ্যায় বেশী ছিল মেয়েরা কারণ রাত মেয়েদের নয়, রাতের সাথে জুড়ে থাকে ভয় এই ধারণাকে ভাঙ্গতে হবে তাকে এবং তার দাবির মধ্যে ছিল গণপরিবহন, সুলভ শৌচাগার, রাস্তাঘাটে আলোর দাবি। এই সমস্যায় জর্জরিত সব মেয়েরা। যিনি সকালে সব্জি বিক্রির জন্য ভোরবেলা প্রথম ট্রেন ধরে আসেন, বা যিনি আয়ার কাজ করে বা প্রাইভেট সেক্টরে কাজ করে রাত ১২ টায় ফেরেন, বা যিনি গৃহপরিচারিকার কাজ করেন প্রত্যেকে একাত্ম হতে পেরেছিলেন এই we want justice স্লোগানের সাথে কারণ justice এর সাথে জুড়ে তার সাথে হওয়া প্রতিটি বঞ্চনা।

সে কারণে একদিনের মধ্যে ডাকা ১৬ই আগস্টের মেয়েদের মিছিলে তিন হাজারের উপর মেয়েরা জমায়েত হতে পারে, কেউ আসে কাকদ্বীপ থেকে কেউ আসে জয়নগর থেকে। পুলিশের চোখ রাঙ্গানি উপেক্ষা করে, নিষেধ অমান্য করে তারা এগিয়ে চলে। এই সময় রোজ কলকাতার কোনও না কোনও জায়গায় মিছিল হয়েছে, প্রতিবাদ সভা হয়েছে, কিন্তু

পথচলতি মানুষ বিরক্ত হয়নি বরং সমর্থন জুগিয়েছে। অংশ নিয়েছে বস্তির মানুষরাও। বিধাননগরের বাসন্তী কলোনির মেয়েরা জন্মাষ্টমীর দিনও এক ডাকে নেমে পরে প্রতিবাদ করতে নিজেদের অধিকারের দাবিতে। সল্টলেক, টালা, বাসন্তী কলোনি সর্বত্রই বস্তি অঞ্চলের মেয়েদের নিরাপত্তা আরও খারাপ, বাথরুম- জলের অবস্থাও করুণ। তারাও তাদের সমস্যা নিয়ে বারবার প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন। শাসক দলের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে তারা প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন যদিও তারা জানেন যে পরবর্তীতে তাদের উপর জোরজুলুম করা হবে, হুমকি দেওয়া হবে।

এই লড়াই কিন্তু হঠাৎ করে মাটি ফুঁড়ে উঠে আসেনি। মেয়েদের প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চলছে বহু বছর ধরে। সেই ১৯০৮ সালে নিজেদের উপর হওয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছিল আমেরিকার বস্ত্র কারখানার মহিলা শ্রমিকরা। দিনে আট ঘণ্টা কাজ, ঠিকঠাক বেতন, ভোটাধিকার ইত্যাদির দাবিতে প্রায় ১৫০০০ মেয়েরা রাস্তায় নামে। সেই আগুনের স্ফুলিঙ্গ দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়ে গোটা বিশ্ব জুড়ে, যার মধ্য দিয়েই মেয়েদের ভোটাধিকার, দিনে আট ঘণ্টা কাজ, সম কাজে সম বেতন, সমানাধিকারের লড়াই শুরু হয়। ১৯১০ সালে শ্রমিক মেয়েদের আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে ক্লারা জেটকিন উপরের দাবীগুলির সমর্থনে নারী দিবস পালনের প্রস্তাব দেন। ১৯১১ তে প্রথম তা পালন হয় ১৯শে মার্চ। ১৯১৭ সালের ৮ই মার্চ রাশিয়ার মেয়ে বস্ত্র শ্রমিকরা পেত্রোগ্রাদে একজোট হয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ে। দিনটিকে বেছে নেওয়া হয় শ্রমজীবী নারী দিবস হিসেবে। এই আন্দোলন থেকেই ডাক আসে জারের স্বৈরতন্ত্র উচ্ছেদ করার, যথাযথ পুষ্টিকর খাবারের দাবিতে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে অকালে মানুষের মৃত্যু, যুদ্ধে মেয়েদের ও শিশুদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার বিরুদ্ধে।

এই হুমকি জোরজুলুমের সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, বৈষম্যের বিরুদ্ধে মেয়েদের এই সংগ্রাম আসলে সেই সময় থেকেই চলছে। আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারী দিবস একে একটি মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। তাই আরজিকরের আন্দোলনের সাথে এক হয়ে যায় বাংলাদেশের বস্ত্র শিল্পের মহিলা শ্রমিকদের আন্দোলন, আফগানিস্তানের মেয়েদের মুসলিম মৌলবাদের বিরুদ্ধে মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার লড়াই, ভারতের হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে মেয়েদের লড়াই।